দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 APR 1993

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার হাল

উত্তরপত্র নেই, তবু ফুল মার্কস ঃ টিচার বলেন নিজে নিজে পড়ো

হাসান হাফিজ ঃ এসএসসি'র বিজ্ঞান প্রথম পত্রের খাতা। একটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য বরাদ্দ নম্বর তিন। পরীক্ষক তাকে দিয়ে দিলেন পাঁচ নম্বর। এক পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তর লেখার পরও পাঁচের মধ্যে দুই পেয়েছে। একই প্রশ্নের ভুল উত্তর লিখে অন্যজন পাঁচের মধ্যে পাঁচই পেয়েছে। পরীক্ষক কিন্তু ভিন্ন নন, ওই একজনই। এ ঘটনার কথা জানালেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে চার বছর প্রধান পরীক্ষক ছিলেন এমন একজন শিক্ষক। বিজ্ঞানের মত একটি কংক্রিট বিষয়েও পরীক্ষার উত্তর-পত্রের যথার্থ মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেই। বিজ্ঞান পঠন, পাঠন, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রচণ্ড গোজামিল।

তিনি আরো কিছু চমকপ্রদ তথ্য আমাদের জানিয়েছেন। তিনি বললেন, এমনও দেখা গেছে একজন পরীক্ষার্থী পেয়েছে ২৬ নম্বর। খাতা পুনঃ পরীক্ষা করে দেখা গেল তার পাওয়া উচিত ৬৫। আবার ৬০ পাওয়া একটি খাতা যাচাই করে দেখা গেল আদতে সে পাসই করে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই শিক্ষক জানান, পরীক্ষকদের অনেকে খাতা না দেখেই নম্বর বসিয়ে দেন। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় খাতা একজন পরীক্ষকই দেখে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে তার ভুল সিদ্ধান্ত একজন ছাত্র বা ছাত্রীর উচ্চাশা, স্বপ্ন চুরমার করে দেয়। প্রধান পরীক্ষকের সর্বোচ্চ ১০ নম্বর দেয়ার ক্ষমতা থাকে। তাকে পাঁচ থেকে ছয় হাজার খাতা পুনঃ পরীক্ষা করতে হয়। সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ খাতা পুনঃ পরীক্ষার জন্য তিনি বোর্ড থেকে টাকা পান। ১০ ভাগের বেশী খাতা দেখলেও এজন্য কোন টাকা পাওয়া যায় না। এসএসসি পরীক্ষার প্র্যাকটিক্যাল সম্পর্কে নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা তিনি আমাদের শোনালেন। ঢাকার মিরপুরের একটি স্কুলে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিতে গেছেন একজন শিক্ষক। তিনি দেখেন, কোন পরীক্ষার্থীরই প্র্যাকটিক্যাল খাতা আদৌ নেই। এক্সটার্নাল শিক্ষককে বলা হল, সবাইকে পূর্ণ নম্বর দিয়ে দিন। খাতার জন্য বরাদ্দ হল পাঁচ নম্বর। ওই শিক্ষক রাজী হলেন না। বললেন, খাতাই নেই, নম্বর দেব কোত্থেকে?

তাকে বলা হল, খাতা না থাক, নম্বর দিতেই হবে। চাপ সৃষ্টি করলেন স্কুলটির প্রধান শিক্ষক। তার সঙ্গে যোগ দিলেন স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন। বিপজ্জনক অবস্থা। 'একটু ঘুরে

(আটের পাতায় ৪–এর কঃ দ্রঃ)

উত্তরপত্র নেই, তবু ফুল মার্কস ঃ টিচার বলেন নিজে নিজে পড়ো

(প্রথম পাতার পর)

আসি' বলে এক্সটার্নাল শিক্ষক বাইরে গিয়ে টেলিফোনে প্রধান পরীক্ষককে বিস্তারিত জানালেন। প্রধান পরীক্ষক তাকে পরামর্শ দিলেন চলে আসার জন্য। যা ঘটার ঘটুক। এক্সটার্নালের সই ছাড়াই প্র্যাকটিক্যালের নম্বর গেল বোর্ডে। বেশী দিন আগের নয়–এটা গত বছরের ঘটনা।

বর্ণিত ঘটনাগুলো শুধু কি এক জায়গায়ই ঘটছে? না। বিভিন্ন স্কুল–কলেজে সরেজমিন দেখে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে এ ধরনের ঘটনার আরো খবর পাওয়া গেছে। এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি? জানতে চাইলে ওই প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষক বলেন, তত্ত্বীয় অংশের সঙ্গে ব্যবহারিক অংশে প্রাপ্ত নম্বর মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। দু' পর্বের নম্বরে যুক্তিসঙ্গত ব্যবধান থাকলে সেটা মেনে নেয়া যায়। ব্যবধান খুব বেশী হলে সেই পরীক্ষার্থী পাস করার উপযুক্ত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পরীক্ষক থাকেন দুজন। দু'জনের কাছে প্রাপ্ত গড় নম্বর চূড়ান্ত হিসাবে ধরা হয়। সে ব্যবস্থা এসএসসি এইচএসসি পর্যায়ে চালু করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান শিক্ষা দান পদ্ধতি সেকেলে, অনুপযোগী, দায়সারা

দেশের স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ছাত্র–ছাত্রীদের যে পদ্ধতিতে পড়ানো হয়, সেটা মান্ধাতার আমলের। এই সিস্টেম বিষয়ের গভীরে যেতে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে না। তাদের মধ্যে জাগায় না কোন অনুসন্ধিৎসা।

বাংলাদেশে শিক্ষাদান পদ্ধতি যা অনুসৃত হচ্ছে, তা অনাধুনিক, অবৈজ্ঞানিক। শিক্ষা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা বলেন, এখন চলছে বক্তৃতা পদ্ধতি। ক্লাস রুমে ঢুকে শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে কিছুটা অংশ পড়লেন। অনেক সময় না পড়েই, না বুঝিয়েই বলে দিলেন–ওইটুকু পর্যন্ত, তোমরা পড়ে আসবে। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাতিল হয়ে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু বাংলাদেশে তা পরিবর্তিত হওয়ার কোন লক্ষণ নেই।

ওই সূত্রটি জানান, ডেমনেস্ট্রেশন পদ্ধতিও অকার্যকর প্রমাণিত হয়ে গেছে। চলতি দুনিয়ায় এখনকার রীতি হল, ছাত্র–ছাত্রীরা নিজের হাতে কাজকর্ম করে শিখবে। মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করবে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা সিদ্ধান্তে পৌছুবে। এ পদ্ধতি বাংলাদেশে চালু করা যায়নি। কবে যে সম্ভব হবে, সেটাও অনিশ্চিত ব্যাপার।

ওই সূত্র জানান, এখন শিক্ষকতায় মেধাবীরা আসছে না। যার কোন গতি হয় না, সে–ই আসে শিক্ষকতায়। পেশা হিসাবে ছাত্র–ছাত্রীদের প্রথম পছন্দ কোনক্রমেই শিক্ষকতা নয়। যারা শিক্ষক হিসাবে আসছেন তাদের মেধার মান সন্তোষজনক নয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একজন সিনিয়র স্পেশালিস্টের মতে, বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত শিক্ষক নির্ভর। মাধ্যমিক পর্যায়ের কথাই ধরুন–শিক্ষক হিসাবে যতটা শ্রম ও সময় দেয়া দরকার–সেটা তারা দিতে পারেন না। ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষার্থীরা। শিক্ষক সমাজ শুধু নয়, এ অবক্ষয় জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। ছাত্র শিক্ষকের আনুপাতিক যে হার বর্তমান, সেটাও শিক্ষার্থীদের যথার্থ শিক্ষা লাভের অনুকূল নয়। ছাত্র সংখ্যা বেশী বলে শিক্ষকরা সেভাবে যত্ন নিতে পারেন না।

ঢাকার পোগোজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জুলফা জানান, মাত্র ৪০ মিনিটের ক্লাস যথেষ্ট নয়। আগে প্রতি ক্লাসে থাকত ৩০ থেকে ৩৫ জন বিদ্যার্থী। এখন সেটা বেড়ে গিয়ে ৭০/৮০ জনে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতিতে শেখানো সে কারণে সম্ভবপর হয় না।

তিনি জানান, ছাত্র কম, শিক্ষক বেশী এমন প্রতিষ্ঠানও আছে। গ্রামাঞ্চলের অনেক জায়গায় শিক্ষকদের প্রধান লক্ষ্যই হল বিভিন্ন বেনিফিট আদায়। পেশার প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা ও মন নেই তাদের।